সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক বিধি

মানুষমাত্রেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রযুক্ত। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থচেতনা ব্যক্তির প্রবণতার মধ্যে বর্তমান থাকে। সুতরাং ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে সামাজিক সংহতি শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। তার ফলে সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সামগ্রিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থার আশঙ্কা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের স্বার্থে কিছু পন্থা পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। এই সকল পন্থা পদ্ধতির সমষ্টিকেই বলা হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control)। সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তি স্বার্থের সংঘাতের কারণেই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হয়। বস্তুত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল একটি বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তি বর্গের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং সমাজের শৃঙ্খলা ও সংহতি সংরক্ষণ করা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতির সমষ্টিকে বোঝায়। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এই সকল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আর এইভাবে সামাজিক সংহতি রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিবর্গের ওপর কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত অনুসারে এই সকল নিয়ন্ত্রণই হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল বিশৃঙ্খলার অনিশ্চয়তা থেকে সমাজকে মুক্ত রেখে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে বাঞ্ছিত ও নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার ব্যবস্থা। অধ্যাপক টম বটোমোরের মতে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল বিশেষ কিছু সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আইন ও আদর্শের সমষ্টি যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীগত ও দলগত বিরোধের মীমাংসা হয় এবং সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ এই প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে সেই পদ্ধতিকে বোঝায় যার দ্বারা সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা সুসংহত ও সংরক্ষিত থাকে এবং একটা পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বজায় রেখে সামগ্রিকভাবে কাজ করে। তাঁরা আরও বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোন গোষ্ঠী বা সমষ্টি সুসংঙ্গতির সঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে কাজকর্ম সম্পাদন করে এবং একটি পরিবর্তনশীল ভারসাম্য বজায় রাখে। যোসেফ রোইসেক (Joseph S. Roucek) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে বলেন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল বিশেষ কতকগুলি প্রক্রিয়া, পরিকল্পনা কিম্বা অপরিকল্পনার সমষ্টি যার সাহায্যে ব্যক্তি শিক্ষা লাভ করে, উদ্বুদ্ধ হয় অথবা দলীয় ও জীবন-মূল্যবোধ হিসাবে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়।

সমগ্র গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে সমাজ তার সদস্যদের ওপর এক বিশেষ প্রভাব প্রয়োগ করে। এই প্রভাবকেই বলা হয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল সামাজিক শৃঙ্খলা সংরক্ষণের এক বিশেষ উপায়। এই উপায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-ব্যবহারকে সামাজিক দিক থেকে বাঞ্ছিত বা অভিপ্রেত পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল ব্যষ্টির সমষ্টির ভূমিকা ও আশা ও আকাঙ্খা এবং তার বাস্তবায়নকে সামাজিক সংহতির স্বার্থে পরিচালিত করা এবং সমাজের প্রবাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখা।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিট্য ঃ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আমরা পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারণা আমাদের কাছে আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হবে।

১) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে এক ধরনের প্রভাবকে বোঝায়। এই প্রভাব কার্যকর হয় লোকাচার, লোকনীতি, ধর্ম, জনমত, বলপ্রয়োগ, সামাজিক পরামর্শ-নির্দেশ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় বা মাধ্যমের সাহায্যে।

২) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কোন লক্ষ্যহীন ব্যবস্থা নয়। এই নিয়ন্ত্রণের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্তমান। এই উদ্দেশ্য হল সমষ্টির কল্যাণ সাধন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব প্রয়োগ করা হয় গোষ্ঠীর সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে। এই প্রভাবের মাধ্যমে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের পরিবর্তে সকলের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কাজকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা হয়। এইভাবে সঠিক সামাজিক পন্থা-পদ্ধতি আবলম্বন করতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়।

৩) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে যে প্রভাবকে বোঝায় সমাজই তা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ওপর প্রয়োগ করে। বিশেষ কোন ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠীই ব্যক্তির ওপর এই প্রভাবকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বলতে বোঝানো হয়েছে পরিবার, শিক্ষায়াতন, ধর্মীয় সংগঠন, ক্লাব, ট্রেড ইউনিয়ান, রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে।

৪) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বহু ও বিভিন্ন উপায় বর্তমান। অবস্থার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির কার্জকারিতার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলতে যে প্রভাবকে বোঝায় তার কার্জকারিতা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্রের পরিবর্তে পরিবারের প্রভাব অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। অনেক সময় আবার পরিবারের তুলনায় রাষ্ট্রের প্রভাব বেশী কার্যকরী হয়। তেমনি আবার অনেক সময় ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাবের থেকে পাড়ার ক্লাবের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব অধিক কার্যকর প্রতিপন্ন হয়।

৫) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক হতে পারে এবং উদ্দেশ্যমূলক বা পরিকল্পিত হতে পারে। সকল সমাজে স্বাভাবিকভাবে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর হতে দেখা যায়। সহজাত বিষয় হিসাবে এগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তির কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এই সকল নিয়ন্ত্রণকে সহজাত বা স্বাভাবিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। পক্ষান্তরে সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি ও সংরক্ষণের স্বার্থে উদ্দেশ্যমূলক বা পরিকল্পিতভাবে কিছু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সৃষ্টি করা হয়।

সামাজিক বিধি ঃ

সমাজের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে (১)সামাজিক প্রথা (custom) ও আচারবিধি (code), যার মধ্যে লোকাচার, লোকনীতি পড়ে, (২) নৈতিক বিধি, (৩) ধর্মীয় বিধি, ও (৪) রাষ্ট্রীয় বিধি বা আইন।

সামাজিক প্রথা বা বিধিকে আমরা দুইভাবে আলোচনা করতে পারি ঃ (ক) সম্প্রদায়গত (communal) ও (খ) সংস্থাগত বা প্রাতিষ্ঠানিক (institutional)

ক) সম্প্রদায়গত আচার-আচরণ বিধি ঃ সমাজ ও সম্প্রদায় মাত্রই বিধি-শাসিত। সমাজে বসবাস করে মানুষ তার দীর্ঘ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানতে পেরেছে - কি ধরনের আচার-আচরণ অনুসরণীয়, আর কি ধরনের আচার-আচরণ বর্জনীয়। এভাবেই ধীরে ধীরে নানা প্রকার আচরণ-বিধি মানুষের সমাজজীবনের অর্ন্তভূক্ত - লোকাচার (folkways), যা অবশ্য পালনীয় আচার বা লোকনীতি(mores) সামাজিক প্রথার অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

প্রথাগত আচার-আচরণ অভ্যস্ত আচরণের অনুরূপ। ‘অভ্যাসকে যে মনস্তাত্ত্বিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় প্রথাকে সাধারণতঃ সেই নিয়মে ব্যাখ্যা করা হয়। বারবার পুনরাবৃত্তির ফলে কোন ক্রিয়া যেমন অভ্যাসে পরিণত হয়, তেমনি লোকাচার লোকনীতিও বারবার অনুসরণ করার ফলে সেসব স্বাভাবিক আচরণের অর্ন্তভূক্ত হয়। অভ্যাসের সাথে প্রথাগত আচরণের পার্থক্য হল - ‘অভ্যাস কোন মূল্যবোধকে অনুসরণ করে না, কিন্তু প্রথার সাথে এক মূল্যবোধ যুক্ত থাকে’। এই ধরনের আচার-আচরণ সমাজের পক্ষে ভাল বা কল্যাণজনক, এমন এক মনোভাব যুক্ত থাকে। তবে এপ্রকার মনোভাব সবসময় যে যুক্তিযুক্ত হয় এমন কিন্তু নয়। অনে ক্ষেত্রেই - যেমন লোকাচারের ক্ষেত্রে এজাতীয় মনোভাবের ভিত্তি হল মানুষের সংস্কার, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বিচার-বিশ্লেষণমূলক না হলেও সুশৃঙ্খল সমাজজীবন যাপনের জন্য লোকাচার অনুসরণ প্রয়োজনীয়।

লোকাচার আবার নানা প্রকার হতে পারে। বেশভূষা সংক্রান্ত, চাল-চলন বা আদব-কায়দা সংক্রান্ত, শিষ্টাচার সংক্রান্ত আহারাদি সংক্রান্ত ইত্যাদি। আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে ‘নেকটাই’ ব্যবহার করা একটি লোকাচার; তেমনি ফিলিপাইনের অধিবাসীদের মধ্যে সোনা দিয়ে দাঁত খোদাই করা বা বাঁধানো একটি লোকাচার। সকল দেশেই উৎসব বাড়িতে ভাল সাজসজ্জা করে যাওয়া একটি লোকাচার। তবে, কেউ যদি এই সকল লোকাচার অমান্য করে তাহলে তার প্রতি বক্র কটাক্ষ বা বক্রোক্তি করা গেলেও কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

ফ্যাশনকেও এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারূপে গণ্য করা চলে, কেননা ফ্যাশনও সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। 'ফ্যাশন' বলতে বোঝায় 'প্রথার গন্ডীর মধ্যে সমাজ অনুমোদিত ব্যতিক্রমের ধারা'। নারী ও পুরুষের পোষাকের মধ্যে প্রথাগত একটা পার্থক্য সকল সমাজেই স্বীকৃত। নারী অথবা পুরুষের প্রথাসম্মত পোষাকের মধ্যে অভিনবত্ব আনাই হচ্ছে ফ্যাশন। কিন্তু নারী যদি পুরুষের পোষাক ও পুরুষ যদি নারীর পোষাক পরিধান করে, তাহলে তা প্রথা বিরুদ্ধ হওয়ায় তাকে ফ্যশনরূপে গণ্য করা হয় না এবং ঐরূপ অঙ্গসজ্জা সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়। লোকাচারের মতো ফ্যাশনের সাথেও কোন মূল্যবোধ যুক্ত থাকে না এবং লোকাচারের মতো ফ্যাশনেরও লক্ষ্য হল - অভিন্ন আচরণের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধকে সুদৃঢ় করা।

অবশ্য পালনীয় আচার বা লোকনীতির সঙ্গে সমাজের ভালো-মন্দ যুক্ত করা হয় বলে লোকনীতি লঙ্ঘন করলে সমাজ ব্যক্তির ওপর যথাসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে তাকে ঐ আচার পালন করতে বাধ্য করে। যেমন - বিবাহ পরবর্তীকালে স্বামী পরস্ত্রীর সঙ্গে এবং স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। সমাজের এই নির্দেশ লোকনীতির অর্ন্তভূক্ত। কেউ যদি এই বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে সমাজ তাকে নানাভাবে নিন্দা করে, ভর্ৎসনা করে, সমাজচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে এইসব ব্যভিচার থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক আচার-বিধি ঃ

সমাজ বা সম্প্রদায়ের অর্ন্তগত কোন সংস্থা বা সংঘের আচার-বিধিগুলি প্রাতিষ্ঠানিক আচার-বিধি (Associational code)। প্রত্যেক সংঘ বা সংগঠনের কিছু কিছু নিয়ম থাকে এবং প্রত্যেক সদস্যকে ঐ সকল নিয়ম বা আচরণ-বিধি মেনে চলতে হয়। কোন সদস্য ঐ সকল আচরণ-বিধি অমান্য করলে, সেই বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা (sanction) প্রত্যেক সংগঠনের থাকে। যেমন কোন ক্লাব বা সমিতির কোন সদস্য যদি সংগঠনের আচার-বিধিকে লঙ্ঘন করে, তাহলে শাস্তি স্বরূপ সদস্য তালিকা থেকে তার নাম খারিজ করা হয়, অথবা কোন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়, অথবা সম্মান জনক পদ থেকে তাকে অপসারিত করা হয়। কোন কর্মসংস্থার কর্মী যদি সেই সংস্থার নিয়ম-কানুন অর্থাৎ আচার-বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে শাস্তি স্বরূপ তার অর্থদণ্ড হয় অথবা চাকুরী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়। কোন ধর্মীয় সংগঠনের কোন সভ্য যদি ধর্মীয় আচার-বিধি অমান্য করে তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাকে ধর্মচ্যুত করা হয়।

নৈতিকবিধি (Moral codes)ঃ নৈতিক বিধি কতকগুলি আচার-আচরণকে স্বতঃভালোরূপে আবার কতকগুলি আচার-আচরণকে স্বতঃমন্দরূপে, অথবা ঐসব আচার-আচরণের লক্ষ্যকে স্বতঃভাল বা স্বতঃমন্দরূপে অনুমোদন বা অননুমোদন করে। নৈতিক বিধিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারূপে (social control) গ্রহণ করা যায় কি-না তা নির্ভর করে, নৈতিক বা নৈতিক-বিধি কথাটির অর্থের ওপর। 'নৈতিক' বলতে কখনো বোঝানো হয় সেই সকল আচরণ-বিধি যাদের সামাজিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় 'যথোচিত' রূপে গ্রহণ করে এবং যে সকল আচরণ-বিধি লঙ্ঘন করলে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় শাস্তির ব্যবস্থা করে। এই অর্থে, নৈতিক-বিধিকে 'সামাজিক আচরণ-নিয়ামকরূপে', বিশেষ করে অবশ্য পালনীয় আচার বা লোকনীতিরূপে (mores) গণ্য করা যায়, যার সাথে সামাজিক ভাল-মন্দ যুক্ত থাকে। 'বাস্তবিকপক্ষে', ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকনীতিগুলি নৈতিক-বিধির সমতুল্য'।

‘নৈতিক’ বলতে কখনো আবার বোঝায় ‘বিবেকের নির্দেশ’ (conscience)। এই অর্থে ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি যে সকল আচার-আচরণকে ‘যথোচিত’ বলে নির্দেশ দেয় কেবল সে সব আচরণই নৈতিক। ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি সমাজ অনুমোদিত আচার-ব্যবস্থাকে যেমন ‘যথোচিত’রূপে নির্দেশ দিতে পারে তেমনি আবার ‘অনুচিত’রূপেও নির্দেশ দিতে পারে। যেমন কোন চিকিৎসক যদি কোন কদাকার বিকলাঙ্গ শিশুর প্রাণনাশ করে তাহলে তা সমাজের নৈতিক-বিধির এমনকি রাষ্ট্রীয়-বিধির বা আইনের বিরোধী হলেও ঐ চিকিৎসকের বিবেকের কাছে যথোচিত অর্থাৎ নৈতিক। এই অর্থে নৈতিক-বিধি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং এই অর্থে নৈতিক-বিধি সামাজিক আচার-বিধির অর্ন্তগত নয়। নৈতিক-বিধি যেখানে সামাজিক, সেক্ষেত্রে ঐ বিধি লঙ্ঘন করলে ব্যক্তিকে নানাভাবে, কখনো নিন্দা করে, কখনো ভর্ৎসনা করে সমাজ সেই ব্যক্তিকে বিধি-বহির্ভূত আচরণ থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে।

৩) **ধর্মীয় বিধি (Religious code)ঃ** ‘ধর্ম’ বলতে সাধারণত বোঝায়, ‘কোন এক বা একাধিক অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং সেই শক্তিকে জীবনে সহায়ক শক্তিরূপে লাভ করার জন্য অথবা তার সান্নিধ্য বা সঙ্গ লাভের জন্য আরাধনা, পূজার্চনা ইত্যাদি অনুষ্ঠান’।
কাজেই ধর্মের দুটি দিক আছে - একটি ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক, অপরটি বহিরঙ্গ। প্রথমটি ব্যক্তিগত, অপরটি ব্যষ্টিগত বা সামাজিক। ধর্মের বহিরঙ্গ অর্থাৎ সামাজিক দিকটিকে কেন্দ্র করে নানা প্রকার ধর্মীয় বিধির প্রচলন আছে - ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন আচরণ-বিধি। ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মাত্রই ঐ সকল আচরণ-বিধিকে অনুসরণ করে চলে এবং সে বিশ্বাস করে যে ধর্মীয়-বিধি অনুসরণ করলে পুণ্য সঞ্চিত হয়, আর তা লঙ্ঘন পাপ হয়। পুণ্য সঞ্চিত হলে ইহজীবনে অথবা পরজীবনে সুখভোগ করা যায়, আর পাপ সঞ্চিত হলে দুঃখভোগ করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয়-বিধি লঙ্ঘন করলে ব্যক্তিকে ধর্মচ্যুত করা হয়।

৪) রাষ্ট্রীয় বিধি (Legal code) ঃ সহজ ও সরল সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথা বা সামাজিক আচার-বিধির কার্যকর ভূমিকা থাকলেও, সমাজের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের গুরুত্ব ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। জটিল সমাজে কেবল প্রথা বা আচার-বিধির মাধ্যমে সমাজের সকল মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এজন্য জটিল সমাজের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য, সমাজস্থ মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অন্য ধরনের বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই নতুন নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাই হচ্ছে রাষ্ট্রীয়-বিধি বা আইন (Law of the State)।

সমাজ বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয়-বিধি বা আইন প্রথা-বিচ্ছিন্ন ভাবে ছিল না। প্রথম অবস্থায় প্রথার দ্বারাই আইন-ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছে ও পরিণত হয়েছে। কাজেই, আইনের মৌলিক ভিত্তি কিন্তু প্রথাই। পরবর্তী কালগুলিতে প্রথা সেখানে সামাজিক প্রগতি বা অগ্রগতির প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে প্রথাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সভ্য ও জটিল সমাজে এজন্য প্রথা অপেক্ষা আইনের গুরুত্ব অনেক বেশি। বলা যায় - দেশাচার, লোকনীতি, প্রথা, আচার-বিধি ইত্যাদির চরম পরিণতি হল রাষ্ট্রীয় বিধি বা আইন।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, আধুনিক জটিল সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেবল একটাই বিধি এবং তা হল রাষ্ট্রীয়-বিধি বা আইন, যা সমাজস্থ সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ক্ষেত্র বিশেষে বল-প্রয়োগ করতে পারে, কারারুদ্ধ করতে পারে, নিঃশর্ত জরিমানা করতে পারে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারে। অবশ্য বল প্রয়োগের অধিকার পরিবারের, বিদ্যায়তনের ইত্যাদি সংগঠনেরও থাকে। অবাধ্য সন্তানকে শাসন করার জন্য পিতা-মাতা বল প্রয়োগ করে থাকেন, দুর্বিনীত ছাত্রকে সুপথে আনার জন্য শিক্ষক মহাশয় বল প্রয়োগ করেন। তবে এসবের প্রতি ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের অধিকার সীমিত এবং ঐ সীমিত অধিকারও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত। রাষ্ট্রই কেবল তার আইনের বিধান অনুসারে নিঃশর্তভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চরম শাস্তি দেবার অধিকারী।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ